স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর : ফিরে দেখা

জয়ন্ত ঘোষাল

স্বাধীনতা সংগ্রাম হল দেশের মাটিকে ফিরে পাওয়ার লড়াই। আমাদের দেশমাতৃকা ব্রিটিশের কাছে পরাধীন ছিলেন দুশো বছর। সেই বন্দিদশা থেকে ভারতমাতার মুক্তির স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দিন গুনছিলেন দেশজননীর প্রতিটি সন্তান। কত প্রাণের বলিদানের পর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টে অর্জিত এই স্বাধীনতা—তা আজ ইতিহাস। সে-মধ্যরাতে ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতায় বলেছিলেন, সারা বিশ্ব যখন ঘুমোবে ভারত তখন জেগে উঠবে তার স্বপ্ন পূরণের আশায়। আজও সেই স্বপ্নপূরণের রসদ—দেশমাতৃকার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, ত্যাগ, নিঃস্বার্থপরতা, দুর্জয় সাহস। তবে ভবিষ্যতের পাথেয় খুঁজতে আমাদের অতীতের দিকেও ফিরে তাকাতে হয়, বারবার শিক্ষা নিতে হয় ইতিহাস থেকে।

ইতিহাসের রাজপথ দিয়েই শুধু হাঁটা নয়, অলিতে গলিতেও অনেক সময় সন্ধান করতে হয় অনেক ছোট ছোট ঘটনার, যা বর্তমানকে বিশ্লেষণে সাহায্য করে। কবি ব্লেক বলেছিলেন, “To see the world in a grain of sand”—বালুকণার মধ্যে বিশ্বকে বিম্বিত হতে দেখা। কত বছর আগের কথা! তখন মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্ব। সেসময় বেশ কয়েকটি কৃষকবিদ্রোহ হয়েছিল। আর দোয়াবের বিদ্রোহ ছিল অনেকটা রক্তাক্ত, দীর্ঘস্থায়ী। দোয়াবের সমৃদ্ধিশালী কৃষক—বিশেষত ক্ষুত, মুকাদ্দাম প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় কৃষক ছিলেন সাহসী, নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা। তাঁরা সরকারি কর্তৃত্ব সহজে মানতেন না; সুলতানদের দুর্বলতার

সুযোগে বিদ্রোহ করতেন। এই বিদ্রোহী কৃষকদের দমন করার জন্য সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম লুট করে, কৃষকদের হত্যা করে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। ইতিহাস সাক্ষী—বস্তুগত যন্ত্রণা থেকে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়, সেই অসন্তোষ থেকে জন্ম নেয় নানা বিদ্রোহ। বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ আর মন্বন্তরের কাহিনি—বিশেষত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, কোম্পানি ও নবাবের দ্বৈত শাসন, কোম্পানির রাজস্বনীতির ফলে ত্রিলোকচন্দ্রের কোষাগার শূন্য হয়ে যাওয়া—এসব কাহিনি বর্ধমানের ইতিহাস থেকে জানা যায়। এইরকম আর্থিক সংকট থেকেই জন্ম নেয় বিদ্রোহ। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে তাই জানতে হবে দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তরের কথা। বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্য সাহিত্যিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় কী অসহায় এবং দুঃখময় ছিল মানুষের জীবন।

লর্ড ক্লাইভের কলকাতায় পদার্পণের সময় ইংরেজদের অবস্থা ভাল ছিল না; আর শেষবার তাঁর ভারত ত্যাগের সময়ে বাংলায় কোম্পানির আধিপত্য বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে। ক্লাইভের পর হ্যারি ভেরেলস্ট (Harry Verelst) গভর্নর হয়ে ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশ শাসন করেন। তারপর জন কার্টিয়ার গভর্নর হন। সেসময় দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ছিল শোচনীয়। ১৭৭০ সালে (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ এবং মহামারিতে সমস্ত বঙ্গদেশ ছারখার হয়ে গিয়েছিল। হিকে সাহেব লিখেছেন, কলকাতায় ১৫ জুলাই থেকে ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ছিয়াত্তর হাজার লোক প্রাণত্যাগ করে। শস্য পর্যাপ্ত পরিমাণ হয়নি, অনাবৃষ্টি, পথঘাট মৃতদেহে পূর্ণ—এই পরিস্থিতিতে কোম্পানি নিজের হাতে দেশের শাসনভার গ্রহণ করল। ওয়ারেন হেস্টিংস হলেন শাসনকর্তা। বণিকের মানদণ্ডের ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটল রাজদণ্ডে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধে ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ভারতে অনেক সাংবিধানিক সংস্কার সাধিত হল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর কাছে বাংলার সিরাজ-উদ্দৌলার পরাজয়ের পর ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনা। এর এক শতাব্দী পর, সিপাহি বিদ্রোহের (১৮৫৭) পরের বছর ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ভারত শাসন আইন অনুসারে কোম্পানির হাত থেকে ভারতের সার্বভৌমত্ব গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনের আওতায় ভারতকে আনার জন্য ১৮৫৮ সালের ২ আগস্ট এই আইন রচিত হয়েছিল। এই আইন অনুযায়ী ভারত শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করা হল ভারতসচিবকে—যাঁকে সাহায্য করার জন্য আবার 'ভারত পরিষদ' নামে পনেরো জন সদস্যের একটি পরিষদ গঠন করা হল। এইভাবে সমস্ত ভারতে একটি কেন্দ্রীভূত প্রশাসন তৈরি হল।

মানুষের ক্ষোভ, বিক্ষোভ, অসন্তোষ কিন্তু এতে থামল না। এইসময়কার বিভিন্ন কবি, পর্যটক, দার্শনিক বঙ্গদেশের সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন, পাশাপাশি দুর্ভিক্ষ-মহামারির চিত্রটিও ইতিহাসের পটে লেখা হয়ে রয়েছে। এই অসন্তোষের মধ্যেই শুরু হল ব্রিটিশের রেলগাড়ির ঝমাঝম, ডাক যোগাযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে নবজাগরণেরও সাক্ষী থাকল বঙ্গবাসী। ইংরেজি-শিক্ষিত মানুষ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করে ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগ, দুঃখের কথা ব্রিটিশ শাসককুলকে জানাতে শুরু করল। ক্রমে জন্ম নিল দুভাগে আন্দোলন—নরমপন্থী ও চরমপন্থী। ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে নানান রকমের বিদ্রোহ এবং আন্দোলন দেখা দিতে লাগল। অনেক গণবিদ্রোহ বা প্রান্তিক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে এই

সময়। মহাত্মা গান্ধির ভারতে আগমন জাতীয় সংগ্রামে এক নতুন মাইলফলক। গান্ধিজীই প্রথম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যিনি অভিজাতের ড্রয়িংরুম থেকে কংগ্রেসকে নিয়ে গেলেন মানুষের কাছে। আমজনতার সঙ্গে যুক্ত করলেন আন্দোলনকে। খিলাফত আন্দোলন থেকে শুরু করে অসহযোগ আন্দোলন, ডান্ডি অভিযান—নানান ধরনের প্রতীকী আন্দোলন সৃষ্টি করে তিনি মানুষের কাছে পৌঁছলেন। তাঁর অতি সাধারণ পোশাক দেখে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল তাঁকে 'অর্ধনগ্ন ফকির' বলেছিলেন। সেই 'অর্ধনগ্ন ফকির' লন্ডনে ব্রিটিশের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠক করতে যান। গান্ধিজীর নেতৃত্বে ভারতের আন্দোলন ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠল। সে-আন্দোলনে বঙ্গদেশও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, ঋষি অরবিন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ—যিনি স্বয়ং 'condensed India'—তাঁর প্রভাব ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কীভাবে চালনা করেছে তা আজ সকলেই জানেন। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী বলেছেন, ''তিনিই ভারতীয় স্বাধীনতার জনক—আমাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার তিনি পিতা।'' তাঁর রচনাবলি পাঠ করে কত যুবক স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন! সন্ন্যাস গ্রহণ করেও দেশের জন্য যুবকদের প্রাণ কেঁদেছে। শিবজ্ঞানে সেবার আদর্শে নরনারায়ণের সেবার মাধ্যমে দেশসেবার কাজে তাঁরা ব্রতী হয়েছেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভূমিকা সুবিদিত। তাঁর 'তরুণের স্বপ্ন' পড়লে মনে হয় কথাগুলি যেন স্বামী বিবেকানন্দের। স্বামীজী যে-কথা যেভাবে বলেছিলেন, যেভাবে তিনি যুবসমাজের মনে উৎসাহ-উদ্দীপনার জোয়ার এনেছিলেন, সেইভাবেই সুভাষচন্দ্র অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং সকলকে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন। কোন ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন আর দেখিয়েছিলেন স্বামীজী? যে-ভারতে সবরকম পরাধীনতারই শুধু নয়, যাবতীয় শোষণ-অত্যাচারের অবসান হবে, ঘটবে গণজাগরণ। মানুষে-মানুষে কোনওরকম ভেদাভেদ থাকবে না। নিঃশেষে মুছে যাবে জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতা, এমনকী নারী-পুরুষেরও ভেদ। স্বাধীনতা সংগ্রামের পঁচাত্তর বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আজ আমরা পিছন ফিরে তাকালে দেখতে পাব, কথাগুলি শুধু স্বামী বিবেকানন্দের নয়, পরবর্তী কালে যখন গণপরিষদ গঠিত হয়েছে সেখানেও আলোচনা হয়েছে ভারতীয় নাগরিকের অধিকার নিয়ে। আলোচনা হয়েছে অস্পৃশ্যতা, জাতপাতের বৈষম্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে এবং সেইভাবে সংবিধান রচনা করা হয়েছে—যাতে সামাজিক ব্যাধিগুলি থেকে মুক্ত করে ভারতীয় নাগরিককে একটি রক্ষাকবচ দেওয়া যায়।

আজ ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা একশো পঁয়ত্রিশ কোটি—যার মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পঁচিশ বছরের নিচে। আজ প্রবীণ-নবীনের প্রজন্মগত ব্যবধান যেমন বেড়েছে, তেমনই বেড়েছে শহর-গ্রামের ব্যবধান, সামাজিক অসাম্য। পৃথিবী জুড়ে একদিকে ধনী আরও ধনী হয়েছে, দরিদ্র আরও দরিদ্র হয়েছে। ভয়াবহ দারিদ্র্য বাড়ছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়।

এই পরিস্থিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর নির্দেশিত পথে আমাদের চলতে হবে। তাঁদের দেখানো পথ আমাদের জীবনগঠনে মস্ত বড় ভূমিকা নেবে। যদি মানুষ তৈরি না হয়, তাহলে দেশ তৈরি হতে পারে না। স্বামীজী বারবার সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। আমি একা কিছু করতে পারি না, একা সমস্যার সমাধান হয় না। এই কারণেই মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। স্বাধীনতা

আন্দোলনে ব্রিটিশ সরকার ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’ নীতি গ্রহণ করেছিল এই একটিই কারণে : ভারত যাতে ঐক্যবদ্ধ না হয়—যাতে এদেশ খণ্ড-বিখণ্ড হয়। কিন্তু অখণ্ড ভারতচেতনায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলশক্তি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরোধিতা। তখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস একটা বিরাট মঞ্চের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল—যে-মঞ্চে মিলিত হয়েছিল নানান ভাবধারা। স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে সেই অখণ্ড ভারতকে আবার খণ্ড-খণ্ড করার নানারকম বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রয়াস হয়েছে। কখনও খালিস্তানি, কখনও মাওবাদী আন্দোলন! এই বিচ্ছিন্নতাবাদের মধ্যে দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে বারবার।

সততা এবং মূল্যবোধ যার নেই তাকে কি মানুষ বলা চলে? তাই স্বামীজী বারবার বলেছেন, ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রয়োজন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কঠোর নৈতিকতা এবং মূল্যবোধকে আশ্রয় করেই মানুষ এগিয়ে চলেছিল। মানুষের মতাদর্শ বিভিন্ন হতে পারে কিন্তু বিবেক, মূল্যবোধ ও নৈতিকতায় কোনও ভেদাভেদ থাকতে পারে না। সকলের জন্যই মূল্যবোধের শিক্ষা প্রয়োজন। দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট বলেছিলেন, “There is no holiday in virtue”—সদাচারের ক্ষেত্রে কোনও ছুটির দিন নেই। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আমাদের সততা, মূল্যবোধ প্রয়োজন। মূল্যবোধ কিছুদিনের জন্য শিকেয় তুলে রেখে আমরা কেউই কর্মযোগী হয়ে উঠতে পারি না। স্বাধীনতা সংগ্রামের যে-মহান অতীতকে মূলধন করে আমাদের পথ চলা, মূল্যবোধের সংকট হলে তাতে খামতি পড়ে যায়। সে-বিষয়ে আমাদের সবসময় সচেতন থাকতে হবে।

সমাজে-সভ্যতায় সমস্যার মূল কেন্দ্রবিন্দু বা মূল কাঠামোয় পরিবর্তন না আনলে সমস্যাগুলি থেকেই যায়। দুর্নীতি, মূল্যবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতির মতো ভয়ংকর সমস্যাগুলিকে প্রথম থেকেই চিহ্নিত করেছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। স্বাধীনতার আগে দেশে উচ্চবর্ণ এবং নিম্নবর্ণের সংঘাত, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান, আর্থিক সংকট, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার সমস্যা ছিল ভয়াবহরূপে। তখন অখণ্ড ভারতকে টিকিয়ে রাখার জন্য ‘নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান’-এর যে-বহুত্ববাদী দর্শন তা সবিস্তারে আলোচনা হয় গণপরিষদে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও উত্তেজনাকে প্রতিহত করার জন্য গান্ধিজী বিভিন্ন প্রান্তে গিয়েছেন। সমস্যাগুলি তিনি নিজের চোখে দেখেছেন; সেগুলি গণপরিষদে আলোচিত হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সেগুলির প্রতিফলন ঘটেছে—সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু আজ স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও, মনে হয় ভারতের অনেক মূল সমস্যার কাঠামোগত পরিবর্তন না হওয়ায় সমস্যাগুলির সমাধান এখনও সম্ভব হয়নি।

এসব সমাধান তখনই সম্ভব হবে যখন মানুষ নিজেদের ছোট ছোট স্বার্থগুলিকে বিসর্জন দিয়ে দেশের কথা আগে ভাববে, মূল্যবোধকে সর্বাগ্রে স্থান দেবে। এইভাবেই কৃষক-শ্রমিক, ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণি, সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে স্বাধীনতার মূল সুর। করতে হবে সাম্যের সাধনা। আর সর্বাগ্রে হতে হবে যথার্থ মানুষ। আজ আমাদের সেই মন্ত্রেই ব্রতী হয়ে এগোতে হবে নতুন অভিমুখে—যেখানে ‘ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে’—এই অঙ্গীকার আমরা গ্রহণ করতে পারব।